ফয়যানে ইসলাম

(নেকীর বাস্তবতা)



লেখক: মুফতী মুহাম্মদ কাসিম কাদেরী دامت برکاتہم العالیہ

অনুবাদ ও উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)
IslamicResearchCenter

ইসলামী আকীদা ও মতাদর্শ, শিক্ষা এবং
অন্যান্য বিষয়ের প্রকৃত ধারণার বর্ণনা

ফয়যানে ইসলাম

(নেকীর বাস্তবতা)

লেখক: মুফতী মুহাম্মদ কাসিম কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

সূচিপত্র

মনোযোগ আকর্ষণ.....৩
নেকীর সংজ্ঞা.....৪
“নেকী” এবং “নেককার ব্যক্তি” এর মাপকাঠি.....৯
প্রকাশ্যে গুনাহকারীকে নেককার বলা কেমন?.....১০
দেখতে নেককার ব্যক্তি কি আল্লাহর দরবারেও নেককার?.....১৫
নেক কাজের স্তর ও তার বিন্যাস.....২৩
বেশি থেকে বেশি নেকী অর্জনের উপায়.....২৬
আমল না করেই সাওয়াব.....৩২
নেককার ব্যক্তির সামনে তার প্রশংসা করা.....৩৪
নেকী কবুল হওয়ার বিষয়টি কীভাবে বোঝা যাবে?.....৪০

মনোযোগ আকর্ষণ

ইসলাম হলো হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে নিয়ে আসা একটি দ্বীন যা আল্লাহ পাক আমাদের জন্য পছন্দ এবং মনোনীত করেছেন। এতে ফরয, হালাল ও হারামের বিধান এবং কিয়াসের নিয়ম-কানুন সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এই ধর্মকে অন্য সব ধর্মের উপর বিজয়ী করা হয়েছে। পূর্ববর্তী শরীয়তগুলোর মতো এই দ্বীন কখনো বাতিল বা রহিত হবে না। বরং এটি কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে। এখন আল্লাহ পাকের দরবারে একমাত্র এই দ্বীনই গ্রহণযোগ্য। এটি ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন, ধর্ম বা মতবাদ কোনোভাবেই গৃহীত হবে না।

ইসলাম ধর্মের ভেতরে অসংখ্য সৌন্দর্যতা রয়েছে, এর প্রতিটি সৌন্দর্য একটির চেয়ে আরেকটি সেরা। যেমন: এটি সম্পূর্ণভাবে মানুষের স্বভাবজাত বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এটি আমলযোগ্য। দুনিয়া ও আখিরাতের সব বিষয়ে এটি সবচেয়ে নিখুঁত পথপ্রদর্শক। একজন মুসলমান হিসেবে এটি আমাদের দায়িত্ব যে, আমরা যেন ইসলাম ধর্মকে সঠিক উপায়ে অনুবাধন করি। এর শিক্ষা এবং আদর্শের ব্যাপারে পুরোপুরি জ্ঞান অর্জন করি। যেমন: ইসলামের দৃষ্টিতে নেকীর আসল রূপ কী, এবং গুনাহের ধারণা কেমন ইত্যাদি। কিছুদিন আগে আমাদের সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় মুফতি মুহাম্মদ কাসিম আত্তারী কাদেরী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي "মাদানী চ্যানেলে" **"ফয়যানে ইসলাম"** নামে একটি ধারাবাহিক অনুষ্ঠান শুরু করেছিলেন। সেখানে ইসলামী আকীদা, আদর্শ, শিক্ষা এবং অন্যান্য বিষয়ের প্রকৃত ধারণা প্রশ্নত্তোর আকারে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছিলেন। এখন সেই ধারাবাহিকতাটি লিখিত আকারে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। আপনারা নিজেরা এটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং অন্যদেরও পড়ার জন্য উৎসাহিত করুন। যাতে আমরা সকলে যেন ইসলাম ধর্মকে এর আসল চেতনা অনুযায়ী অনুধাবন করতে পারি। ধন্যবাদান্তে: ইলমী দুনিয়া টিম।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

নেকীর সংজ্ঞা

প্রশ্ন: নেকী কাকে বলে এবং কুরআন ও হাদিসে এটিকে কীভাবে বর্ণনা করা হয়েছে?

উত্তর: ধর্মের কিছু পরিভাষা এমন রয়েছে যার পারিভাষিক সংজ্ঞা দেওয়া যদিওবা কিছুটা কঠিন, কিন্তু এর সাধারণ মূলভাব সহজেই বোঝা যায়। যেমন: ইলম (জ্ঞান)-এর সংজ্ঞা। কিতাবে ইলমের অনেক পারিবাষিক সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, যা বোঝা বেশ কঠিন। কিন্তু সাধারণ নিয়মে সবাই অনুধাবন করে যে ইলম কী। যখন কারো জ্ঞান অর্জন হয়, তখন সে অনুধাবন করে যে তার ইলম অর্জিত হয়েছে। আর যখন অর্জন হয় না, তখন সে বুঝতে পারে যে তার ইলম নেই। ঠিক একইভাবে, মুসলমানদের কাছে নেকী এবং গুনাহের ধারণাও অত্যন্ত স্পষ্ট। ধর্মপ্রাণ মানুষ, ধর্মকে ভালোবাসেন এমন ব্যক্তি এবং দ্বীনের প্রতি সামান্য অনুরাগ আছে এমন যে কেউই নেকীর অর্থ বুঝেন। শরীয়তের দৃষ্টিতে: "নেকী হলো এমন প্রতিটি কাজ, যা করলে সাওয়াব পাওয়া যায়।" এখন সেই কাজটি সরাসরি দ্বীনি বা ধর্মীয় কাজ হতে পারে। যেমন: "لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه" এর তাসবীহ পড়া। দরুদ শরীফ পাঠ করা। কোন দরিদ্র মানুষকে সাহায্য করা। এই ধরনের সব কাজকেই প্রত্যেক মুসলমান নেকী মনে করে। অথবা এটি এমন কোন সাধারণ জায়িয কাজ হতে পারে যা ভালো নিয়তে করা হয়। যেমন: খাবার খাওয়া। এটি একটি মুবাহ কাজ, খাবার খাওয়া নিজে থেকে কোন সাওয়াবের কাজ নয়, আবার গুনাহের কাজও নয়।

কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি এই ভালো নিয়তে খাবার খায় যে: আমি খাবার খাচ্ছি যাতে মনোযোগ দিয়ে নামায পড়তে পারি। কারণ বেশি ক্ষুধা থাকলে নামাযে মনোযোগ থাকবে না। একইভাবে অন্যান্য জাগতিক কাজগুলোও যদি ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে সহায়তা পাওয়ার নিয়তে করা হয়, তবে সেই দিক থেকে সেগুলোও নেকীর কাজ হয়ে যায়।

মূল কথা হলো নেকীর ধারণাটি খুবই স্পষ্ট। আমরা সাধারণত নেকী বলতে সেই অর্থকেই বুঝি, যা করলে আমরা সাওয়াব পাব। এখন কথা হলো, কুরআন ও হাদিসে নেকীকে কোন শব্দে প্রকাশ করা হয়েছে? উত্তর হলো, পবিত্র কুরআনে নেকীর বর্ণনা দিতে গিয়ে বেশ কিছু সুন্দর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি নিচে তুলে ধরা হলো। একটি (بِرّ) শব্দ:

একটি আয়াতে মুবারাকায় বলা হয়েছে:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَیْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِیْمٌ

(পারা: ৪, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ৯২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তোমরা কখনো পূণ্য পর্যন্ত পৌঁছবে না যতক্ষণ আল্লাহর পথে আপন প্রিয় বস্তু ব্যয় করবে না এবং তোমরা যা কিছু ব্যয় করো তা আল্লাহর জানা আছে।

(خَیْر) শব্দও কুরআন মাজিদে নেকীর অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন একটি আয়াতে মুমুবারকায় আছে:

وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَیْرٍ یَّعْلَمْهُ اللّٰهُ

(পারা: ২, সূরা: বাকারা, আয়াত: ১৯৭)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং তোমরা যেই উত্তম কাজ করবে আল্লাহ সেটা জানেন।

একটি শব্দ (مَعْرُوْف): নেকীর অর্থে পবিত্র কুরআনে এসেছে। একটি প্রসিদ্ধ আয়াতে বলা হয়েছে:

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

(পারা: ৪, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১১০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তোমরা শ্রেষ্ঠতম ঐসব উম্মতের মধ্যে, যাদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে মানব জাতির মধ্যে, সৎকাজের নির্দেশ দিচ্ছো এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করছো, আর আল্লাহর উপর ঈমান রাখছো।

এরপর আরেকটি শব্দ যেটা খুব বেশি নেকীর অর্থে এসেছে, সেটা হলো: "صَالِحٌ" বা "صّٰلِحٰتِ" কুরআনে পাকে নেকীর জন্য সবচেয়ে বেশি সম্ভবত এই শব্দই এসেছে, ভালো আমল বা নেক আমল আমরা সচরাচর ব্যবহার করে থাকি। ইরশাদ করেন:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا

(পারা: ২৪, হা-মীম সিজদা, আয়াত: ৪৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে সে তার নিজের মঙ্গলের জন্য করে আর যে মন্দ কাজ করে তবে তা তার নিজেরই ক্ষতির জন্য করে।

অন্য আয়াতে মুবারাকায় রয়েছে:

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

(পারা: ২৪, সূরা হা-মীম সিজদা, আয়াত: ৩৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর তার চেয়ে কার কথা অধিক উত্তম, যে আল্লাহর প্রতি আহবান করে এবং সৎকর্ম করে, আর বলে আমি মুসলমান।

আর যে সকল আয়াতে মুবারাকায় "الصّٰلِحٰتِ" বলা হয়েছে, সেগুলো তো অনেক, যেমনিভাবে বলা হয়েছে:

وَالْعَصْرِ ۙ﴿۱﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ ۙ﴿۲﴾ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ۬ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

(পারা: ৩০, সূরা: আসর, আয়াত: ১-৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: ঐ মাহবুবের যুগের শপথ, নিশ্চয় মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে ও একে অপরকে সত্যের জন্য জোর দিয়েছে এবং অপরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়েছে।

এমনিভাবে আরেকটি খুব সুন্দর শব্দ "مَرْضَاتِ" এর অর্থ হলো: আল্লাহর সন্তুষ্টি, ইচ্ছা, পছন্দ আর এর মাঝে আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় জিনিস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অন্য শব্দে এইভাবে বলো যে, নেকী কী, কিভাবে হয়, আর আমরা নেকী কেন করি? **উত্তর:** এই জন্যই যে, এটা আল্লাহ পাকের পছন্দ। কুরআনে পাকে নেকীর সাব্যস্ততা এইভাবে বিদ্যমান রয়েছে:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَّشْرِیْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ

(পারা: ২, সূরা: বাকারা, আয়াত: ২০৭)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং কোন কোন মানুষ আপন আপন আত্মাকে বিক্রি করে আল্লাহর সন্তুষ্টির তালাশে। আর আল্লাহ বান্দাদের উপর দয়াবান।

এমনিভাবে আরেকটি শব্দ "حَسَنَةٌ" ও খুব বেশি উল্লেখ রয়েছে। কুরআন মাজীদে রয়েছে:

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا

(পারা: ৮, সূরা: আনআম, আয়াত: ১৬০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: যে কেউ একটা সৎকর্ম করবে, তবে তার জন্য তদনুরুপ দশগুণ রয়েছে।

অর্থাৎ যে একটি নেকী করে তাকে দশগুণ সাওয়াব দেওয়া হয়।

এমনিভাবে "احسان" শব্দটিও নেকীর অর্থে কুরআনে কারীমে বিদ্যমান আছে। অতঃপর ইরশাদ করেন:

هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ

(পারা: ২৭, সূরা: আর রহমান, আয়াত: ৬০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: উত্তম কাজের প্রতিদান কি? কিন্তু উত্তম কাজই।

অথবা ইরশাদ করেছেন:

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

(পারা: ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং সৎ ব্যক্তিবর্গ আল্লাহর প্রিয়।

অনুগ্রহকারীদের অর্থ হলো পূণ্যবান বা ভালো কাজ করা মানুষ। এগুলো এমন কিছু শব্দ যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। আপনি যদি আরও (Search) খুঁজে দেখেন, তবে এমন আরও অনেক শব্দ পাবেন। কুরআনে পাকে নেকী অর্থে যেসব ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলোর প্রতিটির নিজস্ব সৌন্দর্য আছে। "اَلْبِرَّ" শব্দের একটি নিজস্ব রূপ আছে। আবার "حَسَنَةٌ" শব্দের মধ্যে রয়েছে এক অন্যরকম সৌন্দর্য। আরবি ভাষা জানা মানুষ এই অর্থগুলো খুব ভালো করে বুঝতে পারবেন।

"নেকী" এবং "নেককার ব্যক্তি" এর মাপকাঠি

প্রশ্ন: ইসলামে "নেকী" এবং "নেককার ব্যক্তি" এর মাপকাঠি বা মানদণ্ড কী?

উত্তর: নেকীর প্রধানত দুটি দিক আছে: (১) আদেশগুলো মেনে চলা: (২) নিষেধগুলো থেকে দূরে থাকা: এর স্বাভাবিক ভাবানুবাদ হলো, ওই কাজগুলো করা যেগুলো করতে হুকুম দেওয়া হয়েছে, আর যেসব জিনিস থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে তা থেকে বেঁচে থাকা। নেকীর জন্য তো স্বয়ং ওই নেকীর আমলই যথেষ্ট। যেমন: একজন মানুষ নামায পড়ল, সে একটি নেকীর কাজ করল। অথবা কেউ একজন দরিদ্র মানুষকে সাহায্য করল, সে একটি নেকীর কাজ করল। কিন্তু নেককার হওয়া এই বিষয়টি আরও বড় অর্থ বহন করে। নেককার কেবল তাকেই বলা যাবে, যিনি উপরের দুটি দিকই মেনে চলেন। অর্থাৎ, যিনি ভালো কাজও করেন এবং গুনাহ থেকে বেঁচেও থাকেন। উদাহরণস্বরূপ একটি পাখির দুটি ডানা থাকে। নেককার হওয়ার জন্যও এই দুটি বিষয় ডানার মতো কাজ করে। একটি ডানা দিয়ে যেমন পাখি উড়তে পারে না, ঠিক তেমনি কেবল এক দিক মেনে চললে মানুষ নেককার হতে পারে না। আমাদের সমাজেও এর অর্থ এটাই এবং আমাদের ধর্মেও এর ব্যাখ্যা এমনই। যেমন ধরুন, একজন মানুষ তিনি নামাযও পড়েন, রোযাও রাখেন, প্রতিবছর হজ্বও করেন এবং গরীবদের সাহায্যও করেন। কিন্তু এর সাথে সাথে তিনি যদি ঘুষখোরও হয়, তবে কেউ এটা বলবে না যে, যেহেতু তিনি এই এই ভালো কাজগুলো করেন, তাই তিনি শুধু ঘুষই তো নেন, অতএব তিনি একজন নেককার মানুষ। মূল কথা হলো, কোনো সগীরা গুনাহ বার বার করা হলে বা কবীরা গুনাহ করা হলে এবং তা থেকে তাওবা না করা হলে, সে ব্যক্তি নেককার মানুষ নন।

একইভাবে কোনো ব্যক্তি যদি নামাযই না পড়েন, অথবা শুধুমাত্র এক ওয়াক্ত নামায (যেমন ফজরের নামায) ছেড়ে দেন, কিংবা তাঁর উপর জামায়াতে নামায পড়া ওয়াজিব কিন্তু তিনি জামাআতের সাথে নামায পড়েন না, যদিও তিনি বাকি সব কাজ ঠিকঠাক করছেন অর্থাৎ তাঁর চরিত্রও ভালো, তিনি হালাল উপায়ে উপার্জন করেন এবং যিকির-আযকারও করেন তবুও শরীয়তের বিধান হলো, যে ব্যক্তি জামাআত ত্যাগ করে সে ফাসিক এবং 'মরদুদুশ শাহাদাহ' (যার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়)। এ থেকে জানা গেল যে, কাউকে নেককার বলতে হলে তাঁর মধ্যে এই গুণটি থাকা জরুরি যে, তিনি যেমনিভাবে ভালো কাজ করবেন, তেমনি গুনাহের কাজ থেকেও বেঁচে চলবেন।

প্রকাশ্যে গুনাহকারীকে নেককার বলা কেমন?

প্রশ্ন: সমাজে এমন একটি দিকও দেখা যায় যে, কিছু মানুষ প্রকাশ্যে গুনাহ করে বেড়ায়। কিন্তু তাদের মধ্যে কিছু ভালো নৈতিক গুণ থাকার কারণে মাঝে মাঝে তাদেরকে নেককার মানুষ বলা হয়, এমনকি তাদের নেককার মানুষ বলার জন্য জোরও দেওয়া হয়। এ বিষয়ে কিছু ব্যাখ্যা করুন। এছাড়া আপনি নেককার হওয়ার যে ধারণা দিয়েছেন (Concept) তা থেকে কি বোঝা যায় না যে, নেককার হওয়া খুব সহজ নয়?

উত্তর: প্রতিটি ভালো কাজের জন্য সাধারণত একটি নির্দিষ্ট শব্দ থাকে। যেমন: একজন ব্যক্তি তাঁর গরীব আত্মীয়-স্বজনদের খরচের দায়িত্ব নেন, পাড়া-প্রতিবেশী এবং মহল্লার গরীবদের সাহায্য করেন, বছরে বেশ ভালো পরিমাণে সম্পদ (সদকা ও খয়রাত) বিতরণ করেন এবং এই সবকিছুই তিনি হালাল

উপায়ে উপার্জনের মাধ্যমে করেন। তাহলে আমরা তাকে বলব যে সে দানশীলতা বা উদারতার দিক থেকে নেককার (ভালো), অর্থাৎ সে এই নেক কাজটি করছে। তবে যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের দরবারে পুরোপুরিভাবে নেককার হিসেবে গণ্য হবে এবং যাকে (সালেহীন) সৎলোকদের মধ্যে গণনা করা হবে, তার জন্য জরুরি হলো সে যেন উভয় দিকেই অর্থাৎ নেক কাজ করে এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার উপর অবিচল থাকে।

অনুরূপভাবে, একজন মানুষ নামায পড়ে, কিন্তু ব্যবসায় ফাঁকিও দেয়। তো নামায পড়ার দিক থেকে আমরা তাকে বলব যে সে একজন বড় নামাযী। কিন্তু তাকে আমরা পুরোপুরিভাবে নেককার বলতে পারি না। অর্থাৎ নেক কাজ করা এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা হলো নেককার হওয়ার ভিন্ন অংশ (Parts)। সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, যেমন একটি ভবন যার ছাদ নেই তাকে আমরা সম্পূর্ণ ভবন বলি না, কিংবা যার দেয়াল নেই সেটিও সম্পূর্ণ ভবন নয়। অতএব, নেককার হওয়া যার উপর সালেহীন শব্দটি প্রযোজ্য হবে এবং যে আল্লাহর দরবারে নেককার হিসেবে কবুল হওয়ার যোগ্য, সে হলো সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর সমস্ত হুকুম মেনে চলে।

মাঝে মাঝে আল্লাহ পাক কারও সামান্য আমলও কবুল করে তাকে ক্ষমা করে দেন। এটি একটি ভিন্ন বিষয় (Matter), এটি আল্লাহ পাকের রহমত। কিন্তু আমরা যাকে নেককার বলব, তার ব্যাপারে মানুষ চরমপন্থী বা শিথিলপন্থী হয়ে যায়। যেমন: একজন মানুষ বান্দার হকের ক্ষেত্রে খুব ভালো, কিন্তু আল্লাহর হক মোটেও আদায় করে না, সে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনোভাবেই নেককার নয়। কারণ মানুষের হকের সাথে সাথে আল্লাহর হকও রয়েছে। তাই কোন ব্যক্তির মানুষের সাথে লেনদেন বা আচরণ যদি

খুব ভালো হয়, কিন্তু সে যদি নামায না পড়ে, রোযা না রাখে, হজ্ব ফরয হওয়া সত্ত্বেও হজ্ব না করে, যাকাত না দেয়, তবে সে ব্যক্তি নেককার নয়। একইভাবে কোনো মানুষ যদি এই বিষয়গুলোর উপর আমল করে অর্থাৎ নামায পড়ে, রোযা রাখে, হজ্ব করে, যাকাত দেয়, নফল দান- সদকা করে, যিকির-আযকার এবং কুরআন তিলাওয়াতও করে, কিন্তু সে যদি তার প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয়, অন্য মানুষকে বিরক্ত করে, মানুষের হক আদায় না করে, মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করে, তবে এমন ব্যক্তি কখনোই নেককার মানুষ নয়।

অতএব, নেককার হওয়ার জন্য দুটি জিনিস অত্যন্ত জরুরি। এক নম্বর: বান্দা যেন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে এবং এর মধ্যে সুদ, ঘুষ, জুলুম, গীবত, চুগলি, মিথ্যা, মিথ্যা অপবাদ, দোষ চাপানো, কুদৃষ্টি ইত্যাদি সমস্ত গুনাহ থেকে নিজেকে রক্ষা করা শামিল রয়েছে। আর দ্বিতীয় জিনিসটি হলো: মানুষ যেন সমস্ত ফরয এবং ওয়াজিব কাজগুলো পালন করে। এর মধ্যে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, সব বিষয় শামিল রয়েছে। কাজেই যেখানে যখন যার সুযোগ আসবে, সেই অনুযায়ী তা পালন করে যেতে হবে। সুন্নাতে মুয়াক্কাদার উপরও আমল করা উচিত এবং সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ছেড়ে দেওয়ার অভ্যাস থেকে বেঁচে থাকা উচিত, কারণ এই জেদের কারণে মানুষ গুনাহগার হয়ে যায়।

এখন রইল এই কথা যে, এইভাবে নেককার হওয়া তো অনেক কঠিন। এই বিষয়ে প্রথম আরজ হলো, নেক কাজের প্রতিদান অর্থাৎ জান্নাত কোন সাধারণ জিনিস নয়। এর জন্য প্রাণ ও সম্পদের উৎসর্গ করতে হয়, কোন কোন জায়গায় সত্যিই প্রাণ উৎসর্গ করতে হয় এবং কিছু কিছু জায়গায়

নিজের ইচ্ছাকে উৎসর্গ করতে হয়। কুরআনে পাকে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿۴۰﴾ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَاْوٰى ﴿۴۱﴾

(পারা: ৩০, সূরা: নাযিয়াত: আয়াত: ৪০-৪১)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর সেই ব্যক্তি, যে আপন প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবার ভয় করেছে এবং নফসকে (মনকে) কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছে। তবে নিশ্চয় জান্নাতই তার ঠিকানা।

নফসকে নাজায়িয ইচ্ছা থেকে বিরত রাখা আবশ্যক, যেমন: গুনাহের ইচ্ছা। উদাহরণস্বরূপ কুদৃষ্টি দিতে, গীবত করতে মন চাইছে, কিন্তু নিজের নফসকে আটকে রাখতে হবে। মিথ্যা বলার ইচ্ছা আছে যে, মিথ্যা বলবে না, তাহলে কাজ হবে না। বরং নিজেকে আটকে রাখতে হবে। এখন যদি এই সন্দেহ জাগে যে, এটা তো খুব কঠিন, তাহলে কথা হলো, এটি কঠিন হতে পারে, কিন্তু অসম্ভব নয়। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

لَا یُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

(পারা: ৩, সূরা: বাকারা, আয়াত: ২৮৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আল্লাহ কোন আত্মার উপর বোঝা অর্পন করেন না, কিন্তু তার সাধ্য পরিমাণ।

দ্বিতীয় কথা হলো, আল্লাহ পাক মানুষকে "ইচ্ছাশক্তি" নামক এমন একটি জিনিস দান করেছেন, যার সাহায্যে মানুষ "কে-টু" (k2) পাহাড়ের চূড়াও জয় করে ফেলে। অথচ সে পাহাড়গুলোতে আরোহণকারী ব্যক্তিও আমাদের মতোই একজন মানুষ। আমাদের যদি কেউ এই পাহাড়ে উঠতে বলে, তবে আমরা সেখানকার শীত, উচ্চতা, গিরিখাত ও উপত্যকা দেখেই ভয় পেয়ে যাবো এবং আর এক কদমও সামনে বাড়াবো না। কিন্তু, যে ব্যক্তি পাহাড়ে উঠেছে, সে কীভাবে উঠলো? উত্তর হলো: এটি তার ইচ্ছাশক্তির

কারণে সম্ভব হয়েছে। এখন গভীরভাবে চিন্তা করুন, এই পাহাড়গুলোতে উঠা তো খুবই কঠিন কাজ, কিন্তু ইচ্ছাশক্তি ও সাহসের কারণে এই কঠিন কাজও সফলভাবে সম্পন্ন হয়ে যায়। এর তুলনায় দেখুন, নামায পড়া কতটা কঠিন? প্রকৃতপক্ষে নামায পড়ার মধ্যে কোনো বড় পরিশ্রম বা কষ্ট নেই। বরং মানুষকে এটি মানসিক শান্তি দেয়, মনকে প্রশান্তি দেয় এবং শরীরকে পবিত্রতা দান করে। এর ফলে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোও আরাম পায়, কাজের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। এই ইবাদত তো চোখের শীতলতা হয়ে যায়। অধিকাংশ নেক কাজের ক্ষেত্রেই বিষয়টি এমন। একইভাবে গুনাহ থেকে বাঁচার ব্যাপারটিও এমন। প্রথমবার হয়তো গীবত থেকে বাঁচা কঠিন মনে হতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয়বার একটু কম কঠিন লাগবে, তৃতীয়বার সহজ মনে হবে, চতুর্থ বা পঞ্চমবারের মাথায় তার জন্য গীবত না করাটা একদম সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে যাবে এবং এ থেকে বেঁচে থাকাটা তার জন্য আনন্দের বিষয় হবে। কারণ তার এই অনুভূতি হবে যে, আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য গীবত থেকে বেঁচে চলছি। এই জিনিসটিই তার জন্য শান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই এরপর এমন এক সময় আসে যে, নেককার মুমিনের জন্য নিজে গীবত করা তো দূরের কথা, অন্য কেউ যদি গীবত করে তবে তার স্বভাব খিটখিটে ও অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। বুযুর্গানে দ্বীনের এমন অনেক ঘটনা কিতাবে রয়েছে এবং আজও এমন নেককার মানুষজন আছেন যাদের সামনে গীবত শুরু হলে তাদের মানসিকতায় কষ্ট ও অসন্তুষ্টি তৈরি হয়। সারকথা হলো, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং নেক কাজ করা শুরুতে কঠিন মনে হয়। কিন্তু মানুষ যখন চেষ্টা করে, ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে এবং বার বার এমনটা করে, তখন নেককার হওয়া অনেক সহজ হয়ে যায়।

দেখতে নেককার ব্যক্তি কি আল্লাহর দরবারেও নেককার?

প্রশ্ন: এটা কি জরুরি যে, আমরা যাকে নেককার মনে করি, সে আল্লাহর দরবারেও নেককার হবে?

উত্তর: এই প্রশ্নের উত্তরের কয়েকটি দিক হতে পারে। একটি দিক হলো, মানুষ কাকে নেককার মনে করবে? এর উত্তর হলো, মানুষের সামনে যে "নেককার" এর সংজ্ঞার আওতায় পড়বে শরীয়তের দৃষ্টিতে আমাদেরকে তাকেই নেককার মনে করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একজন মানুষ আমাদের সামনে কোন গুনাহ করে না, সমস্ত ফরয-ওয়াজিব এবং সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আদায় করে এবং বাহ্যিক কোনো এমন আলামত নেই যার কারণে তাকে গুনাহগার বলা যায়, তবে আমরা তাকে নেককারই মনে করব এবং শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তার ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ না করা ওয়াজিব। কিন্তু প্রকৃত সত্য বা আসল অবস্থা এর থেকে ভিন্নও হতে পারে। এই ব্যাপারে অনেক হাদিস রয়েছে। কারণ আল্লাহ পাক মানুষের প্রকাশ্য ও গোপন, নির্জন ও লোকালয় সব ধরনের ভালো-মন্দ নিয়ত সম্পর্কে খুব ভালোকরেই জানেন। উদাহরণস্বরূপ এক ব্যক্তি নামাযী, নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায়কারীও, ফরয এবং নফল রোযাও রাখে, দান সদকাও করে। এমনকি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে করতে শহীদও হয়ে গেছে, অথবা সে একজন বড় মাপের আলেম, মানুষ তার থেকে উপকার পাচ্ছে। কিন্তু مَعَاذَاللّٰه ! যদি এগুলোর মধ্যে লৌকিকতা থাকে, তবে আল্লাহ পাকের দরবারে তার হিসাব সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়। যেমনটি পবিত্র হাদিসে বর্ণিত হয়েছে: কিয়ামতের দিন সবার আগে একজন শহীদের ফয়সালা করা হবে। যখন তাকে আনা হবে, তখন আল্লাহ পাক তাকে নিজের নেয়ামতগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সে

সেই নেয়ামতগুলো স্বীকার করবে। তারপর আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করবেন: তুমি এই নেয়ামতগুলোর বদলে কী আমল করেছ? সে বলবে: আমি তোমার রাস্তায় জিহাদ করেছি, এমনকি শহীদ হয়ে গেছি। আল্লাহ পাক বলবেন: তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি তো এই জন্য জিহাদ করেছিলে যেন তোমাকে 'বাহাদুর' বলা হয়, আর তা বলা হয়ে গেছে। তারপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর এমন এক ব্যক্তিকে আনা হবে যে দ্বীনি ইলম শিক্ষা করেছে, অন্যকে শিখিয়েছে এবং পবিত্র কুরআন পাঠ করেছে। যখন সে আসবে, আল্লাহ পাক তাকেও নিজের নেয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেবেন এবং সেও তা স্বীকার করবে। তারপর আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করবেন: তুমি এই নেয়ামতগুলোর বদলে কী করেছ? সে বলবে: আমি ইলম শিখেছি ও শিখিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টির জন্য পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেছি। আল্লাহ পাক বলবেন: তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি তো ইলম এই জন্য শিখেছিলে যেন তোমাকে 'আলিম' বলা হয়, আর কুরআন এই জন্য পড়েছিলে যেন তোমাকে 'ক্বারী' বলা হয়, আর তা বলা হয়ে গেছে। তারপর তার ব্যাপারেও নির্দেশ দেওয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে। তারপর একজন সম্পদশালী ব্যক্তিকে আনা হবে যাকে আল্লাহ পাক সব ধরনের সম্পদ দান করেছিলেন। তাকে এনে নেয়ামতগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে, সেও সেই নেয়ামতগুলোর কথা স্বীকার করবে। আল্লাহ পাক বলবেন: তুমি এই নেয়ামতগুলোর বিনিময়ে কী করেছ? সে বলবে: আমি তোমার পথে যেখানেই প্রয়োজন হয়েছে সেখানেই খরচ করেছি। আল্লাহ পাক বলবেন: তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি তো দান করেছিলে যাতে তোমাকে

দানশীল বলা হয়, আর তা বলাও হয়েছে। তারপর তার ব্যাপারে জাহান্নামের নির্দেশ দেওয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম, ৩/১৫১৩, হাদিস: ১৯০৫)

এ থেকে জানা গেল যে, মানুষের দৃষ্টিতে একজন ব্যক্তি দানশীল, আলেম, ক্বারী, শহীদ বা অন্য কোনো ভালো কাজ করা ব্যক্তি হতে পারে। এখন আমাদের বিবেচনা অনুযায়ী যদি সে ভালো হয়, তবে সে ভালোই এবং আমরা তার প্রতি কোনো খারাপ ধারণা রাখব না যে, অমুক শহীদ রিয়াকার ছিল বা অমুক আলিম রিয়াকার ছিল। এভাবে বলা অপবাদ এবং হারাম। কারণ আমরা অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে জানি না। কিন্তু আল্লাহ পাক প্রকাশ্য ও গোপন উভয়টিই জানেন, তিনি বলেছেন:

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِیْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِیْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَیُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۠

(সূরা: জুমআ, পারা: ২৮, আয়াত: ৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আপনি বলুন, ওই মৃত্যু, যা থেকে তোমরা পলায়ন করো, তা তো অবশ্যই তোমাদের সাথে সাক্ষাত করবে। অতঃপর তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফেরানো হবে, যিনি অপ্রকাশ্য-প্রকাশ্য সব কিছুই জানেন, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন যা তোমরা করেছিলে।

সুতরাং আল্লাহ পাক জানিয়ে দেবেন যে, বান্দারা কী করত এবং তাদের নিয়ত কী ছিল? একটি বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ পাক পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টির আগে সাত ফেরেশতাকে সৃষ্টি করেন এবং প্রতিটি আকাশের দরজায় তার মর্যাদা অনুযায়ী একজন করে একটি ফেরেশতাকে দারোয়ান নিযুক্ত করা হয়েছে। অতঃপর كِرَامًا كَاتِبِينَ বান্দার আমলসমূহ নিয়ে আকাশের

দিকে উপরে ওঠে। সেগুলোতে সূর্যের আলোর মতো আলো ও চমক থাকে। এমনকি তারা প্রথম আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। كِرَامًا كَاتِبِينَ সেই আমলকে অনেক বেশি এবং খাঁটি মনে করে। তারপর তারা যখন দরজায় পৌঁছায়, তখন সেখানকার নিয়োজিত ফেরেশতা তাদের বলে: এই আমলটি এই আমলকারীর মুখে ছুড়ে মারো। আমি গীবতের উপর নিযুক্ত ফেরেশতা। আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন এমন ব্যক্তির আমল উপরে যেতে না দিই, যে মানুষের গীবত করে সে আমাকে ছেড়ে অন্যদের দিকে মনোযোগ দেয়।

তারপর দ্বিতীয় দিন ফেরেশতারা এমন কিছু আমল নিয়ে উপরে যায় যেগুলোতে নূর বা আলো থাকে। ফেরেশতারা সেগুলোকে অনেক বেশি ও পবিত্র মনে করে, এমনকি তারা যখন দ্বিতীয় আকাশ পর্যন্ত পৌঁছায়, তখন সেখানকার দারোয়ান ফেরেশতা বলে: থেমে যাও এবং এই আমলটি এই আমলকারীর মুখে ছুড়ে মারো। কারণ এই আমল দ্বারা তার উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়া উপার্জন করা। আমার রব আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন এমন কোনো ব্যক্তির আমল উপরে যেতে না দিই যে আমাকে ছেড়ে অন্য কারও দিকে মনোযোগ দেয়। এরপর ফেরেশতারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার উপর লানত বা অভিশাপ দিতে থাকে।

كِرَامًا كَاتِبِينَ বান্দার আমলসমূহ নিয়ে উপরে যায় এবং সেগুলো দেখে অনেক খুশি হয়। সেগুলোর মধ্যে সদকা, রোযা এবং অনেক নেক কাজ থাকে। ফেরেশতারা সেগুলোকে অনেক বেশি ও পবিত্র মনে করে। তারপর তারা যখন তৃতীয় আকাশ পর্যন্ত পৌঁছায়, তখন সেখানকার দারোয়ান ফেরেশতা বলে: থেমে যাও এবং এই আমলটি আমলকারীর মুখে ছুড়ে মারো।

আমি অহংকারীদের উপর নিয়োজিত ফেরেশতা। আমার রব আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি এমন কোনো ব্যক্তির আমল উপরে যেতে না দিই, যে আমাকে ছেড়ে অন্য কারও দিকে মনোযোগ দেয়। এই লোক মজলিস বা মানুষের সভায় অহংকার ও নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করত।

এভাবেই ফেরেশতারা বান্দার আমল নিয়ে উপরে যান। সেই আমলগুলো তারার মতো ঝলমল করতে থাকে। সেগুলোর মধ্যে তাসবীহের আওয়াজ থাকে। সেগুলোর মধ্যে নামায, রোযা, হজ্ব ও ওমরা থাকে। ফেরেশতারা যখন এই আমলগুলো নিয়ে চতুর্থ আকাশে পৌঁছান, তখন সেখানকার নির্ধারিত ফেরেশতা তাদের বলেন, থেমে যাও! এই আমলটিকে আমলকারীর মুখের উপর ছুড়ে মারো। আমি অহংকার ও আত্মতৃপ্তি দেখার দায়িত্বে থাকা ফেরেশতা। আমার রব আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন এমন কোনো মানুষের আমল উপরে যেতে না দিই, যে আমাকে ছেড়ে অন্যের দিকে মনোযোগী হয়। এই ব্যক্তি যখনই কোনো আমল করত, তখনই সে অহংকারে লিপ্ত হতো।

একইভাবে ফেরেশতারা অন্য কোনো বান্দার আমল নিয়ে উপরে যান। সেই আমলগুলো এমনভাবে সুসজ্জিত থাকে, যেমনটি কনে শশুর বাড়ীতে যাওয়ার সময় সেজে থাকে। সেই আমলগুলোর মধ্যে জিহাদ ও হজ্বের মতো আমল থাকে। সেগুলোর উজ্জ্বলতা সূর্যের মতো হয়ে থাকে। ফেরেশতারা যখন সেগুলো নিয়ে পঞ্চম আকাশে পৌঁছান, তখন দ্বাররক্ষী ফেরেশতা বলেন, আমি হিংসাকারীদের ফেরেশতা। এই ব্যক্তি মানুষের সেই সমস্ত নেয়ামতের প্রতি হিংসা করত, যা আল্লাহ তাদের নিজের অনুগ্রহে দান করেছেন। এই ব্যক্তি আল্লাহর পছন্দ নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিল। আমার রব আমাকে

নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন এমন ব্যক্তির আমল উপরে যেতে না দিই, যে আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের দিকে মনোযোগী হয়েছে, এবং ফেরেশতারা অন্য এক বান্দার আমল নিয়ে উপরে যান। সেগুলোর মধ্যে উত্তম অযু, অনেক নামায, রোযা, হজ্ব এবং ওমরা থাকে। সেগুলো যখন ষষ্ঠ আকাশে পৌঁছায়, তখন দরজার নির্ধারিত রক্ষী ফেরেশতা বলেন, আমি রহমতের ফেরেশতা। এই আমলগুলো আমলকারীর মুখের উপর ছুড়ে মারো। কারণ, এই ব্যক্তি কখনো কোন মানুষের প্রতি দয়া করত না। কোন বান্দা বিপদে পড়লে সে আনন্দিত হতো। আমার রব আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন তার আমল উপরে যেতে না দিই যারা আমাকে ছেড়ে অন্যদের দিকে মনোযোগ দেয়।

ঠিক এভাবেই ফেরেশতারা একজন বান্দার আমল নিয়ে উপরে যান, যার মধ্যে অনেক দান-সদকা, নামায, রোযা, জিহাদ এবং খোদাভীতি থাকে। তাদের আওয়াজ মেঘের গর্জনের মতো এবং তাদের চমক বিদ্যুৎ চমকানোর মতো হয়। তারপর, তারা যখন সপ্তম আসমানে পৌঁছান, তখন সেই আসমানে নিযুক্ত ফেরেশতা বলেন: আমি আলোচনা ও খ্যাতির জন্য নিযুক্ত ফেরেশতা। এই আমলকারী ব্যক্তি নিজের আমল দিয়ে মজলিসে আলোচনা, বন্ধুদের মধ্যে বড়ত্ব এবং বড় বড় মানুষের কাছে মর্যাদা পাওয়ার নিয়ত করেছিল। আমার প্রতিপালক আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন তার আমলকে উপরে যেতে না দিই যে, সে আমাকে ছেড়ে অন্যের দিকে মনোযোগী হয়েছে। আর যে আমল আল্লাহর জন্য খাঁটি বা নিষ্কলুষ নয়, তা লোক দেখানো। আল্লাহ পাক লোক দেখানো আমল কবুল করেন না।

ঠিক একইভাবে "كِرَامًا كَاتِبِينَ" বান্দার আমল যেমন নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, ওমরা, ভালো চরিত্র, নীরবতা এবং আল্লাহর যিকির নিয়ে উপরে যান। সপ্তম আসমানের ফেরেশতারাও তাদের সাথে থাকেন। এমনকি তারা সমস্ত বাধা অতিক্রম করে আল্লাহর দরবারে পৌঁছে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে যান। তারা বান্দার আমল নেক এবং খাঁটি হওয়ার সাক্ষ্য দেন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: তোমরা আমার বান্দার আমলের হেফাযতকারী, আর আমি তার অন্তরের পাহারাদার। সে নিজের এই আমল দিয়ে আমার সন্তুষ্টির ইচ্ছা করেনি, সে এটিকে আমার জন্য খাঁটি করেনি এবং এই আমলে তার যে নিয়ত ছিল তা আমি ভালোকরেই জানি। তার উপর আমার অভিশাপ। সে আমার বান্দাদেরও ধোঁকা দিয়েছে এবং তোমাদেরও ধোঁকা দিয়েছে। কিন্তু সে আমাকে ধোঁকা দিতে পারে না। কারণ, আমি অদৃশ্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে অবগত এবং অন্তরের চিন্তাভাবনা সম্পর্কেও জানি। কোন গোপন জিনিস আমার কাছে গোপন নয় এবং কোনো দূরবর্তী বস্তু আমার থেকে দূরে নয়। আমার জ্ঞান বর্তমানের অবস্থার ব্যাপারেও ঠিক তেমনই যেমনটা ভবিষ্যতের সাথে রয়েছে এবং আমার জ্ঞান অতীতের বিষয়গুলোর সাথে ঠিক তেমনই যেমনটি বর্তমান বিষয়গুলোর সাথে রয়েছে এবং আগের মানুষদেরকে আমার জ্ঞান যেমন পরিবেষ্টন করে রেখেছে ঠিক তেমনই পরের মানুষদেরকেও পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আমি প্রতিটি গোপন বিষয় খুব ভালোকরেই জানি। তাহলে আমার বান্দা কীভাবে আমাকে ধোঁকা দিতে পারে? সে তো কেবল অজ্ঞাত মানুষদের ধোঁকা দেয়। অথচ আমি তো সমস্ত অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কেও অবগত। সেই বান্দার উপর আমার অভিশাপ। এখন সাতজন ফেরেশতা এবং তাদের সাথে থাকা তিন হাজার ফেরেশতা বলেন: হে আমাদের রব! তার

উপর আপনারও অভিশাপ এবং আমাদেরও অভিশাপ। তারপর আসমানবাসীরা বলেন: তার উপর আল্লাহর অভিশাপ, লানতকারীদের অভিশাপ। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ৩৯৬)

ফেরেশতাদের দৃষ্টিতে সেই আমলগুলোই পুরোপুরি সঠিক হয় যা খুব সুন্দর নিয়মে, অত্যন্ত বিনম্রতা ও একাগ্রতার সাথে নামায পড়া হয়। তাকবীরে উলার (প্রথম তাকবীর) সাথে, জামাআতের সাথে, প্রথম কাতারে এবং গভীর মনোযোগের সাথে নামায পড়ছিল। পুরো নামাযে সে শরীর চুলকায়নি, এদিক-ওদিক তাকায়নি, চোখ তোলেনি, তার কিরাতের আওয়াজও খুব সুন্দর ছিল, সবকিছুই খুব ভালো ছিল, তাই তার আমলগুলো ভালো। কিন্তু আল্লাহ পাক তার মনের অবস্থা জানেন যে, তার এই সমস্ত একাগ্রতা, মনোযোগ এবং যা কিছু ছিল, তার সবকিছুই মানুষকে দেখানোর জন্য, তাই সেই আমল প্রত্যাখ্যান করা হয়। একইভাবে হাদিস শরীফে এসেছে, কিয়ামতের দিন কিছু মানুষকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে। এমনকি যখন তারা জান্নাতের কাছাকাছি পৌঁছাবে এবং তার সুঘ্রাণ পাবে, তার প্রাসাদগুলো এবং জান্নাতবাসীদের জন্য আল্লাহ পাকের তৈরি করে রাখা নেয়ামতগুলো দেখে নেবে, তখন আওয়াজ দেওয়া হবে, এদেরকে জান্নাত থেকে ফিরিয়ে দাও, কারণ জান্নাতে এদের কোনো অংশ নেই। (এই আওয়াজ শুনে তারা...) এমন আফসোসের সাথে ফিরে আসবে যে, তাদের মতো আফসোসের সাথে এর আগে কোন মানুষ ফিরে আসেনি। তারপর তারা আবেদন করবে, হে রব! আপনি যদি আপনার পক্ষ থেকে প্রতিদান এবং আপনার ওলীদের জন্য প্রস্তুত করা নেয়ামত দেখানোর আগেই আমাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দিতেন, তবে তা আমাদের জন্য

অনেক সহজ হতো। আল্লাহ পাক বলবেন: আমি তোমাদের সাথে এমন ইচ্ছা এজন্যই করেছি যে, (এর কারণ হলো) তোমরা যখন নির্জনে থাকতে তখন বড় বড় গুনাহ করে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঘোষণা করতে। আর যখন মানুষের সাথে দেখা করতে, তখন বিনয় ও নম্রতা দেখাতে। তোমরা মানুষকে তোমাদের এমন অবস্থা দেখাতে যা তোমাদের অন্তরে আমার জন্য ছিল না, তোমরা মানুষকে ভয় পেতে কিন্তু আমাকে ভয় পেতে না, তোমরা মানুষকে সম্মান করতে কিন্তু আমার সম্মান করতে না, তোমরা মানুষের কারণে মন্দ কাজ ছেড়ে দিতে, কিন্তু আমার কারণে মন্দ কাজ ছাড়তে না। তাই আজ আমি তোমাদের সাওয়াব থেকে বঞ্চিত করার পাশাপাশি নিজের আযাবের স্বাদও আস্বাদন করাব। (মু'জামুল আওসাত, ৪/১৩৫, আল হাদিস: ৫৪৭৮)

এই পুরো আলোচনা থেকে জানা গেল, আমাদের সামনে যে ব্যক্তি যেমন আসবে, আমরা তাকে তেমনই নেক বা ভালো মনে করব এবং তার প্রতি কোন কুধারণা করব না। বাকি প্রকৃত অবস্থা কী, তা আল্লাহ পাক এবং তাঁর বান্দার মধ্যকার বিষয়।

নেক কাজের স্তর ও তার বিন্যাস

প্রশ্ন: গুনাহের মধ্যে যেমন সগীরা (ছোট) এবং কবীরা (বড়) গুনাহ রয়েছে, এই বিন্যাস কি নেক কাজের মধ্যেও আছে?

উত্তর: গুনাহের মধ্যে এই বিন্যাস সুপরিচিত, সগীরা গুনাহ এবং কবীরা গুনাহ। কিন্তু নেক কাজের ক্ষেত্রে 'সগীরা ও কবীরা' পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয় না, যদিও নেক কাজের মধ্যে ছোট ও বড় নেক কাজ রয়েছে।

প্রশ্ন: নেক কাজের মধ্যে ছোট ও বড় হওয়ার পরিচয় কীভাবে পাওয়া যেতে পারে?

উত্তর: নেক কাজের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে অনেক দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, একটি পার্থক্য হলো ফরযের মর্যাদা সবার চেয়ে উপরে, এরপর ওয়াজিবের স্থান, তারপর সুন্নাতের স্থান এবং সবশেষে নফলের স্থান।

নেক কাজের মধ্যে দ্বিতীয় পার্থক্য হলো, ফরযের সাওয়াব নফলের চেয়ে সত্তর গুণ বেশি হয়, এটি প্রতিটি আমলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অর্থাৎ, ফরয নামাযের সাওয়াব নফল নামাযের চেয়ে, ফরয রোযার সাওয়াব নফল রোযার চেয়ে, ফরয যাকাতের সাওয়াব নফল সদকার চেয়ে এবং ফরয হজ্বের সাওয়াব নফল হজ্বের চেয়ে সত্তর গুণ বেশি।

নেক কাজের মধ্যে তৃতীয় পার্থক্য হলো, ভাল কাজের মধ্যেও একটি অপরটির তুলনায় মর্যাদার দিক দিয়ে পার্থক্য থাকে। যেমন: ঈমানের পর সবচেয়ে উত্তম আমল হলো নামায, এটি সবকিছুর চেয়ে বড় নেক কাজ। যাকাত ও রোযা এর পরে আসে, এরপর হজ্বের ফযিলত। একইভাবে বিভিন্ন পবিত্র হাদিসে বিশেষ কিছু বিষয়ের ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অমুক আমলটি উত্তম এবং অমুক আমলটি তার চেয়ে কম (মর্যাদার)। যেমনটি হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: "কোন আমলটি সবচেয়ে উত্তম? তিনি ইরশাদ করলেন: আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এর উপর ঈমান আনা। জিজ্ঞাসা করা হলো: তারপর কোনটি? তিনি ইরশাদ করলেন: আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। আরজ করা হলো: তারপর কোনটি? তিনি ইরশাদ করলেন: মকবুল হজ্ব (হজ্জে মাবরুর)। (বুখারী, ১/২১, আল হাদিস: ২৬)

অনুরূপভাবে, এটি একটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হাদিস, যার ব্যাখ্যার উপর সম্পূর্ণ একটি কিতাব রয়েছে যে, রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, ঈমানের সত্তটির চেয়েও বেশি শাখা রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো لَا اِلٰهَ اِلَّا الله বলা এবং সবচেয়ে নিম্ন স্তরের (শাখা) হলো, রাস্তা থেকে কোন কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া। আর লজ্জা হলো ঈমানের একটি মৌলিক শাখা। (মুসলিম, ১/৬৩,হাদিস: ৩৫)

এখন এখানে বলে দেওয়া হয়েছে যে, সত্তরের চেয়ে বেশি স্তর রয়েছে যার মধ্যে সবচেয়ে বড় ও মহান নেকী হলো لَا اِلٰهَ اِلَّا الله। আর এই সব নেকী যা সত্তরের চেয়ে বেশি, তা ৭২ বা ৭৯টি। এই হাদিসের ব্যাখ্যা বিশদভাবে কিতাবে লেখা হয়েছে। ইমাম বায়হাকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কিতাব "শুয়াবুল ঈমান" এই বিষয়ের উপরই রচিত হয়েছে। শুয়াবুল ঈমান এর অর্থ হলো: ঈমানের শাখাসমূহ। একটি হাদিসে পাক এভাবেও পরিচিত যে, "আল্লাহ পাকের নিকট ফরযের পর সমস্ত আমলের চেয়ে বেশি প্রিয় আমল হলো কোনো মুসলমানের হৃদয়ে আনন্দ প্রবেশ করানো।"

(মু'জামু কবীর, ১১/৭১,হাদিস: ১১০৭৯)

এখন এটি অন্যান্য আমলের চেয়ে বড় নেকী এই কারণে হয়েছে যে, ফরয তো নিজেই একটি বড় নেকী এবং তা বিশেষ একটি শ্রেণি (Category)। এর পরে হলো নফলের স্তর (Category) শুরু হয়েছে, এগুলোর মধ্যে যা সবচেয়ে উপরের নেকী, তা হলো কোন মুসলমানের হৃদয়ে আনন্দ প্রবেশ করানো, এটি লেনদেন এবং মানুষের সাথে সম্পর্কের বিষয়ের সাথে যুক্ত। আর যদি আল্লাহ পাকের হকের দিক থেকে দেখেন, যেমন অনেক হাদিসে পাকে এসেছে যে, সবচেয়ে উত্তম নেকী হলো আল্লাহ পাকের

যিকির। আবার যিকিরের মধ্যেও স্তর রয়েছে, উত্তম যিকির হলো لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه। অর্থাৎ সমস্ত যিকিরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফযিলত ও সবচেয়ে বড় নেকী এবং যিকির হলো لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه পড়া। উত্তম দোয়া اَلْحَمْدُ لِلّٰه। একইভাবে পবিত্র আয়াতগুলো থেকেও জানা যায় যে, এগুলোর মধ্যে একটি ধারাবাহিকতা রয়েছে। যেমনটি বেশিরভাগ জায়গায় যাকাতের আগে নামাযের কথা এসেছে। আল্লাহ পাকের বাণী:

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

(পারা: ২, সূরা: বাকারা, আয়াত: ৪৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং নামায কায়েম রাখো ও যাকাত দাও।

যদিও ধারাবাহিকতা থেকে কোনো ফিকহি হুকুম বা বিধান প্রমাণিত হয় না, তবে শেষ পর্যন্ত যাকাতকে কেন প্রথমে উল্লেখ করা হয়নি? এর হিকমত সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, নামায হলো শ্রেষ্ঠ ইবাদত, তাই একে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে। যাকাতের মর্যাদা নামাযের পরে, তাই এটাকে পরে উল্লেখ করা হয়েছে।

বেশি থেকে বেশি নেকী অর্জনের উপায়

প্রশ্ন: এমন কোন নেক আমল আছে, যা কম সময়ে বেশি বেশি নেকী অর্জন এবং আল্লাহ পাকের সবচেয়ে বেশি নৈকট্য লাভের মাধ্যম হবে?

উত্তর: যে ব্যক্তি বেশি বেশি সাওয়াব ও নেকী অর্জন করতে চাই এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ করতে চাই, তার জন্য প্রথম উপকারী পরামর্শ হলো সে যেন নিজের আমল সুন্নাত অনুযায়ী করে নেয়। কারণ নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক পদ্ধতি হলো সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেভাবে নামায পড়েছেন সেভাবে নামায পড়া,

যেভাবে তিনি রোযা রেখেছেন সেভাবে রোযা রাখা, যেভাবে তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের যিকির করেছেন, তিলাওয়াত করেছেন, নেকীর দাওয়াত দিয়েছেন, উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করেছেন, নিজের পরিবারের সাথে আচরণ করেছেন এবং জীবন অতিবাহিত করেছেন ঠিক সেভাবে জীবন গড়ে তোলা এবং সীরাতে তায়্যিবা (পবিত্র জীবন চরিত্র)-এর অনুসরণ করাই সবার চেয়ে উত্তম, পরিপূর্ণ ও সুন্দরতম পথ। যার আমল সুন্নাতের যত কাছাকাছি হবে, সে আল্লাহ পাকের দরবারে তত বেশি নিকটবর্তী হবে। বেশি সাওয়াব ও নৈকট্য লাভের জন্য দ্বিতীয় পরামর্শ হলো মানুষ যেন নিজের অধ্যয়ন (জ্ঞানার্জন) বৃদ্ধি করে, কুরআন ও হাদিসে এমন অনেক আমলের কথা বর্ণিত হয়েছে যেগুলোকে উত্তম আমল বলা হয়েছে। দুটি আমলের মধ্যে একটি উত্তম হয় এবং অন্যটি 'মাফদূল' (কম উত্তম) হয়। অর্থাৎ, একটি বেশি মর্যাদাপূর্ণ এবং অন্যটি কম মর্যাদাপূর্ণ। যেমন একটি হলো 'আযিমত' (দৃঢ় বিধান) এবং অন্যটি 'রুখসত' (শিথিল বিধান)। তাই আযিমতকে গ্রহণ করা উচিত। দুটি নেক কাজের মধ্যে বড় নেক কাজটি গ্রহণ করার চেষ্টা করা উচিত।

কুরআন ও হাদিস অধ্যয়নের মাধ্যমে অনেক উত্তম আমলের জ্ঞান অর্জন হবে। যেমন: হাদিস শরীফে বলা হয়েছে: "তোমাদের মধ্যে সেই সবচেয়ে উত্তম, যে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়।"

(বুখারী, ৩/৪১০, হাদিস: ৫০২৭)

এর থেকে জানা গেল যে, উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন তিনি যিনি কুরআন শিখেন এবং শিখান। একইভাবে ইরশাদ হয়েছে: "তোমাদের মধ্যে সেই সবচেয়ে ভালো, যে তার পরিবারের কাছে ভালো।" **(তিরমিযী, ৬/১৯২, হাদিস: ৩৮৯৫)** এর থেকে জানা গেল যে, পরিবারের কাছে যে যত ভালো, সে তত

নেককার। অতএব, এখন যদি নেককার হতে চান, আল্লাহ পাকের বেশি নৈকট্য লাভ করতে চান, তবে নিজের পরিবারের সাথে বেশি বেশি ভালো ব্যবহার করা শুরু করে দিন। বাবা-মায়ের যত বেশি আনুগত্য করা হবে, আল্লাহ পাকের তত বেশি নৈকট্য লাভ হবে। একইভাবে রাতে নফল নামায পড়ার কয়েকটি সময় রয়েছে। একটি সময় হলো ইশার ঠিক পরপরই, একটি হলো মধ্যরাতে, একটি হলো রাতের শেষ প্রহরে। আর শেষ প্রহরের নামাযের মর্যাদা সবচেয়ে বেশি, তাই এটিকে গ্রহণ করা উচিত। এভাবে চেষ্টা করলে প্রতিটি নেক কাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম নেক কাজের জ্ঞান লাভ করা যাবে। আমি নিজে এটি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেছি এবং প্রায় এক হাজারের কাছাকাছি এমন হাদিস দেখেছি যেখানে এমন অসংখ্য আমলের ব্যাপারে শেষ্ঠ, উত্তম, ভালো, সর্বোচ্চ ইত্যাদি শব্দ রয়েছে, এই নেকী সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বা উত্তম বা ভালো। এইভাবে অনেক আমল রয়েছে।

অধিক নেকী অর্জনের তৃতীয় পদ্ধতি: নিয়তের ইলম শিখা, কারণ নেক আমল তো একই হয়ে থাকে, কিন্তু দুজন আমলকারীদের মধ্যে নিয়তের দিক দিয়ে অনেক পার্থক্য। উদাহরণস্বরুপ, যায়েদ এবং বকর নামের দুজন ব্যক্তি একই আমল করে, কিন্তু তাদের মধ্যে কোন একজন নিয়ত বেশি করে থাকে, যেমন: উভয়ই মসজিদে আসে এবং একজনের নিয়ত শুধুমাত্র মসজিদে এসে নামায পড়া, অথচ অপরজন এর সাথে সাথে আরো ত্রিশটি নিয়ত করে নিল যে, মসজিদে যাচ্ছি তো খানায়ে খোদার যিয়ারত করবো, মুসলমানদের নৈকট্য হাসিল করবো, নেককার লোকদের সাথে সাক্ষাত করবো, নামাযের পর মুসাফাহা করবো, নামাযের অপেক্ষায় থাকবো, নামাযের পরও দীর্ঘক্ষণ বসে থাকবো, আল্লাহ পাকের যিকির করবো, মসজিদে বসার ফযিলত লাভ করবো, ইতিকাফের নিয়ত করবো, কেউ অসুস্থ

হলে তাঁর সেবা করবো, কোন পেরেশানগ্রস্ত ব্যক্তির পেরেশানী দূর করবো, মুসলমানদের ভালো মন্দ জিজ্ঞাসা করবো, মুচকি হাসি দিয়ে সাক্ষাত করবো। এখন সে যত নিয়ত বাড়াবে তার সাওয়াবও বেড়ে যাবে এবং ততটাই নেকী হবে। অনেক সময় নেকীতে পার্থক্য এই সকল নিয়তের কারণে হয়ে থাকে, দুজন মানুষ একই আমল করছে কিন্তু একজন তার অধিক নিয়তের কারণে রুহানিয়্যতও অর্জন করে নেয়, মুত্তাকীও হয়ে যায়, নেককারও হয়ে যায়, আল্লাহ পাকের নৈকট্যও অধিক হাসিল করে নেয়। সুতরাং নিয়তের বিষয়টি খুবই সুন্দর এবং অনেক বড়, এই কারণে বুযুর্গানে দ্বীন নিয়তকে যথারীতি একটি সায়েন্স অর্থাৎ একটি ইলম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, নামাযের শরয়ী মাসায়িল, রোযার শরয়ী মাসায়িল, যাকাতের শরয়ী মাসায়িলের মতো তাঁরা যথারীতি নিয়তের শরয়ী মাসায়িল শিখতেন এবং আমল করার পূর্বে নিয়তকে উপস্থিত করে নিতেন, যেমন: হযরত সূফিয়ান সাওরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর ঘটনা, তিনি হযরত হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর জানাযার নামায পড়েননি। যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি তাঁর জানাযার নামায কেন পড়েননি? তখন তিনি বললেন: যদি আমার নিয়ত উপস্থিত হতো তবে পড়তাম। (লুবাবুল আহইয়া, পৃ: ৩৬৮)

এমনিভাবে আরেকজন বুযুর্গুর ঘটনা, তাঁকে বলা হলো যে, আসুন অমুক কাজ করার জন্য, তিনি বললেন: দাঁড়ান, অতঃপর কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পর রওনা দিলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলেন যে, হুযুর! এটা কি? যখন বলেছি তখনই চলতেন, বললেন: আমি দাড়িয়ে প্রথমে নিয়ত ঠিক করেছি যে, আমি কেন যাচ্ছি কোন নিয়তে যাচ্ছি? এরপর চললাম। অর্থাৎ নিয়তের জন্য কিছুক্ষণ থামলাম।

নিয়তের জ্ঞান মহান ইলমের মধ্যে একটি ছিল, যা অন্যান্য ইলমের মতো যুগে যুগে হ্রাস পেতে লাগলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এখন দাওয়াতে ইসলামীর পরিবেশের কারণে এই ধারাবাহিকতা পুনরায় শুরু হয়ে গেল, যেমন: খাবারের পূর্বে তো مَاشَآءَالله এখন আমাদের বাচ্চারাও নিয়ত করে নেয় যে, ইবাদতের শক্তি অর্জনের নিয়তে খাবার খাচ্ছি। আর হতে পারে যে, বাচ্চাটির এই বাক্যের মর্মার্থ কী যে, সে কী বলছে, তা জানে না, কিন্তু যখন তার বুঝে আসবে তখন সে বুঝে বলতে শুরু করবে। এখন অনেক মানুষের মাঝে অনেক ভালো নিয়ত শুরু হয়ে গেছে। এটা খুব সুন্দর পদ্ধতি, এর উপর আমীরে আহলে সুন্নাত এর পুস্তিকাও এসে গেছে এবং বহু কিতাবও বিদ্যমান। এই পুস্তিকা পড়ে নিন এবং এরপর নিজের কাজের মধ্যে চিন্তা করুন তবে অনেক নিয়ত করা যেতে পারে।

অধিক নেকী অর্জনের চতুর্থ পদ্ধতি হলো: ওই কাজ করুন যা সদকায়ে জারীয়া হয়, কারণ এটি শেষ হয়ে যাওয়া নেকী নয়, উদাহরণস্বরুপ: কেউ একজন পুরো একটি মসজিদ বানিয়ে দিল এবং পুরো মসজিদ বানাতে পারেনি কিন্তু নিজের অংশটা সম্পৃক্ত করে নিল, অনুরূপভাবে মাদরাসা নির্মাণ করা, কাউকে দ্বীনি কিতাব উপহার দেওয়াও সদকায়ে জারীয়া, যতজন লোক পড়বে, আমল করবে, সেগুলোর সাওয়াব আপনি পেতে থাকবেন। একইভাবে যদি কেউ মুবাল্লিগ হয়, বয়ান ও তাকরীর করেন, তার বয়ান শুনে মানুষ কোন আমল শিখল এবং আমল করা শুরু করে দিল, এখন মুবাল্লিগ তো বয়ান করে চলে গেলেন, কিন্তু যারা শুনেছে পঁচিশ - পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত আমল করতে থাকলেন, এত বছর পর্যন্ত এর সাওয়াব মুবাল্লিগও পেতে থাকবে। একইভাবে কাউকে একক প্রচেষ্টার মাধ্যমে বা তাকে দ্বীনি

ইজতিমায় নিয়ে আসার কারণে বা কাউকে কাফেলায় সফর করানোর কারণে একজন ব্যক্তি দাওয়াতে ইসলামীর পরিবেশে চলে আসল, সে দাড়ি শরীফ রেখে দিল, মাথায় পাগড়ী সজ্জিত করল, নামায পড়া শুরু করে দিল, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা শুরু করে দিল, তবে ওই নেককার হওয়া ব্যক্তির পুরো জীবনের নেকী মুবাল্লিগ পেতে থাকবে। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে কল্যাণের দিকে কাউকে আহবান করবে, সে আমলকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে।" (তিরমিযী, ৪/৩৩৮, হাদিস: ২৬৭০)

সুতরাং যেগুলো সদকায়ে জারীয়ার কাজ, যেমন: ইলমে দ্বীনের প্রসার করা, অন্যের সংশোধনের চেষ্টা করা, নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে দেওয়া, কোন দ্বীনি কিতাব রচনা করা ইত্যাদির সাওয়াব ব্যক্তিটি মারা যাওয়ার পরেও পেতে থাকবে। যেমন: ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "বুখারী শরীফ" লিখেছেন, তিনি তো দুনিয়া থেকে ইন্তেকাল করেছেন কিন্তু বুখারী শরীফ আজও চলছে, আর ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মর্যাদা ও স্তর এবং নৈকট্য ও সাওয়াব বৃদ্ধি করছেন। এমনিভাবে ইমামে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ফিকহে হানাফির ভিত্তি রেখেছেন, শরয়ী মাসায়িল উদ্ভাবন করেছেন, লক্ষ লক্ষ মাসআলার ব্যাপারে মানুষদেরকে হালাল-হারামের পরিচয় করিয়েছেন। আর আজও মানুষ ওই মাসআলাগুলোর অনুসরণ করছে, এইভাবে শত শত শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে গেছে, কিন্তু পুরো দুনিয়ার কোটি কোটি লোকের আমলের সাওয়াব ইমামে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর রুহ মুবারক পাচ্ছেন, সুতরাং সদকায়ে জারীয়া বা সাওয়াবে জারীয়ার কাজ যতবেশি সম্ভব করা উচিত।

আমল না করেই সাওয়াব

প্রশ্ন: আমল না করেই কি সাওয়াব বা নেকী পাওয়া সম্ভব?

উত্তর: হ্যাঁ, এর কয়েকটি উপায় রয়েছে:

১. ভালো নিয়ত, শুধুমাত্র ভালো নিয়ত করল আর সাওয়াব পেয়ে গেল। হাদিস শরীফে এসেছে: "যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু তা করতে পারল না, তার জন্য একটি নেকী লেখা হয়। আর যদি সে কাজটি করে, তবে তার জন্য দশটি নেকী লেখা হয়।"

(মুসলিম, ৭৯ পৃ:, হাদিস: ১৬২)

যেমন: একজন মানুষ যদি নিয়ত করে যে, সে সারা জীবন জামআতের সাথে নামায পড়বে। নিয়ত মানে হলো মনের দৃঢ় ইচ্ছা। মানুষ যত বেশি ভালো কাজের নিয়ত করবে, তত বেশি সাওয়াব পেতে থাকবে। তাই নিয়ত হলো একটি বড় মাধ্যম, যার মাধ্যমে আমল না করেও সাওয়াব পাওয়া যায়।

২. কিছু ক্ষেত্র এমন যে, হাদিস শরীফে বলা হয়েছে: আমল না করা সত্ত্বেও সাওয়াব পেয়ে যাবে, যেমন: একটি হাদিসে মুবারাকায় রয়েছে: "যে ব্যক্তি কোন ভালো কাজ করছিল, এর মধ্যে অসুস্থতা বা সফরের কারণে সে তা করতে পারল না, তার জন্য ঠিক ততটুকুই সাওয়াব লেখা হবে, যতটুকু সে সুস্থ ও মুকিম থাকা অবস্থায় করত।"

(শরহুস সুন্নাহ লিল বাগভী, ৫/২৩৯, হাদিস: ১৪২৭)

যেমন: কোন মানুষের প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর এক পারা কুরআন তিলাওয়াত করার অভ্যাস আছে। সে যদি অসুস্থ হয়ে যায় আর অসুস্থতার কারণে তিলাওয়াত করতে পারছে না, অথবা চোখের সমস্যা হয়ে গেল যার কারণে তিলাওয়াত করতে পারছে না, তাহলে আল্লাহ পাক

অসুস্থতার সময়েও তাকে প্রতিদিন এক পারা তিলাওয়াত করার সাওয়াব দান করতে থাকবেন। একইভাবে এক ব্যক্তি নফল, তাহাজ্জুদের অভ্যস্ত ছিল, এখন সফর বা অসুস্থতার কারণে সুযোগ পাচ্ছে না, তাহলে আল্লাহ পাক এই বান্দাকে রোগ ও সফরের সময়েও সেই সাওয়াব দান করবেন। সুতরাং আমল না করেও সাওয়াব অর্জন করার একটি উপায় হলো এই যে, মানুষ সুস্থতা ও স্থায়ীভাবে বসবাসের সময়ে বেশি থেকে বেশি নেক কাজ করবে। তাহাজ্জুদ, যিকির-আযকার, তিলাওয়াত, দরূদ শরীফ এবং অন্যান্য নেক আমলের অভ্যস্ত থাকবে। একইভাবে এমন বার্ধক্য যাতে মানুষ আমল করতে পারে না, যদি সে সুস্থতার সময়ে আমল করত, তবে বার্ধক্যের সময়েও আল্লাহ পাক তাকে সেই সাওয়াব দান করবেন। এটি দ্বিতীয় উপায় যার মাধ্যমে মানুষ আমল না করেও সাওয়াব অর্জন করতে পারে।

নিয়তের বিষয়টি এর চেয়েও ব্যাপক যে, নিয়ত তো যেকোন মানুষই করতে পারে। যেমন একটি ঘটনা আছে যে, বনী ইসরাঈলের উপর প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের সময় ছিল। এক ইবাদতকারী বালির একটি টিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তার মনে এই খেয়াল আসল হায়! আফসোস, এই বালির টিলাটি যদি আটার টিলা হতো আর আমি তা বনী ইসরাঈলের মাঝে বিলিয়ে পেট ভরিয়ে দিতাম। আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈলের নবীর কাছে ওহী পাঠালেন, আমার এই বান্দাকে বলে দিন যে, তোমাকে এই টিলার সমান বনী ইসরাঈলকে আটা খাওয়ানোর সমপরিমাণ সাওয়াব দেওয়া হয়েছে, আমি তোমার এই নিয়তের কারণে এত সাওয়াব দিয়ে দিয়েছি।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, পৃ: ১২৬)

সুতরাং ভালো নিয়ত করাও আমল না করে সাওয়াব অর্জন করার একটি মাধ্যম। কিন্তু ভালো নিয়তের পরিচয় হলো এই যে, যখনই সময় ও

সুযোগ আসবে, সে আমলও করবে। কেবল নিয়তই করতে থাকা কখনো কখনো এটি শয়তানের একটি চালও হয়ে দাঁড়ায় যে, সে মানুষকে শুধু নিয়তের মাঝেই ব্যস্ত করে রাখে, কাজ করতে দেয় না, সমস্ত নিয়ত করে নিয়ে যখন সুযোগ এলো তখন এক টাকার কাজও করলো না, এটি এই কথার লক্ষণ হবে যে তার নিয়ত মোটেও ছিল না।

নেককার ব্যক্তির সামনে তার প্রশংসা করা

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে নেককার, তার সামনে তাকে নেককার বলা এবং তার নেক কাজের প্রশংসা করা উচিত কি না?

উত্তর: প্রশংসা মিথ্যাও হতে পারে আবার সত্যও হতে পারে। মিথ্যা প্রশংসা করা হারাম এবং এতে আনন্দিত হওয়াও হারাম। মিথ্যা প্রশংসায় খুশি হওয়ার ব্যাপারে কুরআন পাকে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে:

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَاۤ اَتَوْا وَّ يُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۸۸﴾

(পারা: ৪, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১৮৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: কখনো ধারণা করবেন না তাদেরকে, যারা সন্তুষ্ট হয় আপন কৃত কর্মের উপর এবং চায় যে, কাজ করা ছাড়াই তাদের প্রশংসা করা হোক, এমন লোকদেরকে শাস্তি থেকে দূরে মনে করবেন না এবং তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

সত্য প্রশংসা করার অনেকগুলো পদ্ধতি বা দিক রয়েছে। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে অসংখ্য সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ এর প্রশংসার কথা বর্ণিত রয়েছে এবং এর মধ্যে অনেক প্রশংসা সাহাবায়ে কেরাম

رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর সামনেই করা হয়েছিল। যেমন: সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর গুণাবলী তাঁর সামনেই বর্ণনা করেছিলেন। উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যখন তাবুক যুদ্ধের সময় বার বার মুজাহিদদের জন্য উট এবং খাদ্যশস্যের খরচ পেশ করেছিলেন, তখন নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে বললেন, আজকের পর উসমানকে কোন আমল ক্ষতি করবে না। (মুসনদে ইমাম আহমদ, ৫/৬০৩, হাদিস: ১২৬৯৬)

অনুরূপভাবে সেই বরকতময় হাদিস যা আশারায়ে মুবাশশারা (জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়া দশজন) সম্পর্কে এসেছে। যেখানে দশজন ব্যক্তির নাম নিয়ে নিয়ে বলা হয়েছে যে, জান্নাতী, জান্নাতী। একইভাবে বদরের সাহাবীদের মর্যাদার কথাও বলা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর উপস্থিতিতে বললেন, তোমরা আমার পরের লোকদের অনুসরণ করো, অর্থাৎ আবু বকর ও ওমর। (তিরমিযী, ৬/৫০, হাদিস: ৩৬৬২)

সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ সম্পর্কে বললেন, আমার সাহাবীরা নক্ষত্র সমতুল্য। তাদের মধ্যে যাকেই অনুসরণ করবে, তোমরা সঠিক পথ পেয়ে যাবে। (জামে বয়ানুল ইলমে ওয়া ফদ্বলিহি, ২/৯২৫, হাদিস: ১৭৬০)

এইভাবে প্রশংসার তালিকাটি অনেক বড়, এজন্যই হাদিসের কিতাবসমূহে নিয়মিত একটি বড় অধ্যায় থাকে, যার নাম "المناقب کتاب"। কিতাবুল মানাকিব-এর অর্থ হলো: প্রশংসার অধ্যায়। এর মধ্যে অনেক প্রশংসা এমন রয়েছে যা সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ-এর সামনেই করা হয়েছিল। অতএব, সামনে প্রশংসা করার বৈধতা তো রয়েছে, কিন্তু এর পাশাপাশি এর শর্তাবলী এবং সতর্কতাগুলোর প্রতি খেয়াল রাখাও জরুরি, কারণ অন্যদিকে এমন হাদিসসমূহও রয়েছে যাতে সামনে প্রশংসা করতে নিষেধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে: "إِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ الذَّبْحُ" অর্থাৎ তোমরা

একে অপরের প্রশংসা করা থেকে বেঁচে থাকো, কারণ এটি হলো জবেহ করা। (ইবনে মাজাহ, ৪/৬৮০, হাদিস: ৩৭৪৩)

ইরশাদ করেন: "اِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ অর্থাৎ যখন তোমরা অতিমাত্রায় প্রশংসাকারীদের দেখবে, তখন তাদের মুখে মাটি ঢুকিয়ে দিবে। (মুসলিম, ৪/২২৯৭, হাদিস: ৬৯ (৩০০২)

তাই এই বিষয়ে নিষেধকারী হাদিসও রয়েছে। আবার কিছু ক্ষেত্রে প্রশংসা করার অনুমতি এবং আমল করার কথাও পাওয়া যায়, এগুলোর প্রতিটিরই আলাদা আলাদা প্রেক্ষাপট রয়েছে। নিয়ম হলো যেখানে প্রশংসা করার পেছনে কোনো দ্বীনি কল্যাণ বা প্রয়োজন থাকে, আর যার প্রশংসা করা হচ্ছে তার কোনো ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে, সেখানে মুখে প্রশংসা করা জায়েজ।

দ্বীনি বা ধর্মীয় উপকার হলো, যেমন: কোন ব্যক্তি ভালো কাজ করে, তখন অন্য মানুষের সামনে তার প্রশংসা করে বলা হলো, "مَاشَآءَالله! তিনি কত সুন্দর কাজ করেছেন, "مَاشَآءَالله! তিনি কত যুগ ধরে তাহাজ্জুদ পড়ছেন কিংবা তিনি সোমবারের রোযা রাখার অভ্যস্ত ব্যক্তি। অথবা আমাদের জামেয়াতে ছাত্ররা পরীক্ষা দেয় এতে শিক্ষার্থীরা ভালো স্থান অধিকারকারীকে পুরস্কৃত করা হয়। এটিও এক ধরনের প্রশংসা যে, সে পরীক্ষায় ভালো স্থান অর্জন করেছে। প্রশংসার ভালো দিক হলো কাউকে উৎসাহিত করার জন্য প্রশংসা করা। যখন কোনো মানুষের প্রশংসা পাওয়ার লোভ বা আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই কোনো ভালো প্রশংসা পাওয়া যায়, তখন তা মূলত মহান আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ উপহার। যাইহোক, যিনি প্রশংসা করছেন এবং যার প্রশংসা করা হচ্ছে উভয়েরই নিজেদের অবস্থা নিয়ে চিন্তা করা

উচিত। সবচেয়ে ভালো হয় কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন ছাড়া যে কারো সামনে প্রশংসা না করা, বরং তা এড়িয়ে যাওয়া উচিত। আর যার প্রশংসা করা হচ্ছে, তার মনে সব সময় মহান আল্লাহ পাকের গোপন রহস্যের ব্যাপারে ভয় থাকা উচিত। কারণ, সে জানে না যে সে একজন পূর্ণাঙ্গ আলিম হবে নাকি বালআম বিন বাউরার মতো হবে, কেউই জানে না।

প্রশংসা করার একটি ভালো দিক: কারো কারো প্রশংসা কখনো কখনো এই উদ্দেশ্যেও করা হয়, যেন সে অন্য মানুষের জন্য একটি আদর্শ বা অনুসরণের মাধ্যম হয়ে ওঠে। যেমন কোন মজলিসে খুব বড় একজন আলিমে দ্বীন উপস্থিত আছেন, সেই সময় তার সামনে এটি বলা যে, مَاشَآءَالله এই হযরত অনেক বড় আলিম, অমুক জায়গা থেকে এসেছেন এবং এইভাবে তার নেকী, তাকওয়া ও পরহেযগারীর কথা বর্ণনা করা সঠিক। আর এই সময় প্রশংসা করার উদ্দেশ্য এটি হওয়া উচিত যে, আমি এজন্য প্রশংসা করছি যাতে অন্যদের মনে সেই আলিমে দ্বীনের প্রতি অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। কারণ, অন্তরে নেককার ব্যক্তি এবং আলিমের প্রতি ভালোবাসা তৈরি হওয়াটা মুক্তির একটি মাধ্যম। মানুষের অন্তরে যখন আলিমের প্রতি ভালোবাসা তৈরি হবে, তখন তারা তাঁর কাছ থেকে মাসআলা জিজ্ঞেস করবে, তাঁর কথা শুনবে এবং তার মজলিসে বসতে পছন্দ করবে। প্রশংসাকারী ব্যক্তি যখন এই নিয়তে প্রশংসা করবে, তখন অন্য মানুষদের মনে যে আগ্রহ তৈরি হবে এবং এরপর তারা যে উপকার লাভ করবে, তার সমান সাওয়াব প্রশংসাকারী ব্যক্তিও পাবে। এই দিক থেকে তার প্রশংসা করা ভালো বিষয়, এতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু যার প্রশংসা করা হচ্ছে, আসল বিপদ তার জন্য। কারণ, প্রশংসা শুনে মনের ভেতর খ্যাতির মোহ তৈরি

হওয়া, রিয়াকারীর মধ্যে পতিত হওয়ার আশঙ্কা এবং নিজে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করার (অহংকার) শিকার হওয়ার ভয় থাকে। এজন্য দ্বীনের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি হলো, সামনা-সামনি প্রশংসা করা থেকে বিরত থাকা উচিত, তবে এটি মনে রাখতে হবে যে, আউলিয়া কেরাম বা সেইসব বুযুর্গ ব্যক্তি, যাদের নেকী ও তাকওয়া প্রমাণিত এবং যাদের ব্যাপারে মানুষের ভালো ধারণাও অনেক বেশি, বরং যাদের প্রশংসার কোন প্রয়োজনই নেই এমন ব্যক্তিদের সামনে তাদের প্রশংসা করা বহুলাংশে বিপদ থেকে নিরাপদ থাকে। যেমন, আলা হযরত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ-এর সামনে তাঁর শানে যখন মাওলানা আব্দুল আলিম সিদ্দিকী মিরাঠী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ একটি পুরো কাসিদা (প্রশংসামূলক কবিতা) পড়েছিলেন, তখন আলা হযরত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাকে যথাযথভাবে পুরস্কৃত করেছিলেন। এখন প্রশ্ন হলো, এটি কী ছিল? এটি মূলত একদিকে ছিল উত্তম নিয়ত এবং অন্যদিকে আলা হযরত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বিনয়ী, নম্রতা, একনিষ্ঠতা ও তাকওয়ার বহিঃপ্রকাশ। একইভাবে অন্যান্য অনেক আলিম ও আউলিয়াদের ব্যাপারে এই ধরনের ঘটনা পাওয়া যাবে।

প্রশংসার মধ্যে একটি খারাপ দিকও থাকতে পারে। সেটি হলো, প্রশংসা মানুষের মনে রিয়াকারী বা লোক দেখানোর মানসিকতা তৈরি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এক ব্যক্তি নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন। প্রশংসা পাওয়ার পর কোন একদিন তাহাজ্জুদ পড়ার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তিনি এই কারণে নামায পড়তে লাগলেন যে, আমি যদি আজ তাহাজ্জুদ না পড়ি, তবে লোকে কী বলবে? তারা ভাববে আমি তাহাজ্জুদ পড়ি না। অর্থাৎ তিনি মানুষের ভালো ধারণার সম্মান রাখতে নামায পড়ছেন, মানুষের সু-ধারণা বজায় রাখার জন্য তিনি এমন কাজ করছেন, সুতরাং আমি আমল

করবো যেমন ইমাম আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সারারাত ইবাদত করা বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কুরআন মুখস্ত করার মতো বড় ঘটনা। কিন্তু এখন তিনি তাহাজ্জুদ পড়ছেন যাতে মানুষ তাকে তাহাজ্জুদগুযার মনে করে। এটি সরাসরি লোক দেখানো বা রিয়াকারী, যদি রিয়াকারী মনোভাব চলে আসে, তবে এর চেয়ে বড় ধ্বংস আর কী হতে পারে যে, আমলও বরবাদ হলো এবং গুনাহও নিশ্চিত হলো। অতএব, যেখানে এই ধরনের আশঙ্কা থাকে, সেখানে সামনা-সামনি প্রশংসা করা থেকে বেঁচে থাকা উচিত।

প্রশংসা করার দ্বিতীয় নেতিবাচক দিকটি হলো; মানুষ 'হুব্বে জাহ' বা খ্যাতির মোহে পড়ে যেতে পারে। অর্থাৎ মানুষ নিজের প্রশংসা শুনতে পছন্দ করতে শুরু করে, তার মনে ইচ্ছা জাগে যে, মানুষ যেন তার প্রশংসা করে। 'জাহ' অর্থাৎ সম্মান এবং খ্যাতির প্রতি ভালোবাসা নিজের মধ্যে তৈরি হওয়া একটি নিন্দনীয় গুণ। এটি হয়তো সরাসরি গুনাহ নয়, কিন্তু এটি মানুষকে গুনাহের দিকে নিয়ে যায়। এটি গুনাহের দিকে নিয়ে যাওয়ার এমন এক মাধ্যম, যেমন উপর থেকে পানি ফেললে তা নিচের দিকেই যায়। অর্থাৎ 'হুব্বে জাহ' বা খ্যাতির মোহ মানুষকে বেশিরভাগ সময়ই গুনাহের দিকে টেনে নিয়ে যায় এবং এ থেকে খুব কম মানুষই বাঁচতে পারে। ইমাম গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **'মিনহাজুল আবেদীন'** গ্রন্থে এ বিষয়ে খুব সুন্দর একটি কথা বলেছেন, "সিদ্দিকীন বা সত্যবাদীদের অন্তর থেকে সবার শেষে যে জিনিসটি দূর হয়, তা হলো 'হুব্বে জাহ' বা খ্যাতির মোহ ও পদের ভালোবাসা।

(ইহইয়াউল উলুম, ৩/৮২১)

অর্থাৎ তারা লৌকিকতা থেকে বের হয়ে যায়, অহংকার থেকে বের হয়ে যায় এবং হিংসা-বিদ্বেষ থেকেও বের হয়ে যায়। কিন্তু প্রশংসা পছন্দ করার বিষয়টি শেষ পর্যন্ত মানুষের সাথে থেকে যায়। অবশ্য বিশেষ কিছু

ব্যক্তিবর্গরা শয়তানের উপর জয়ী হতে পারেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে শয়তান তাদের মনকে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেয়, তাই কারও সামনে তার প্রশংসা করা খুবই নাজুক একটি বিষয়, এজন্য নিয়ম হওয়া উচিত যেন সামনা-সামনি কারও প্রশংসা না করা হয়।

নেকী কবুল হওয়ার বিষয়টি কীভাবে বোঝা যাবে?

প্রশ্ন: আল্লাহ পাকের দরবারে নেকী কবুল হচ্ছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে তা কীভাবে বোঝা যাবে?

উত্তর: এর প্রথম উপায় হলো আল্লাহ পাকের প্রতি 'হুসনে জন' বা ভালো ধারণা রাখা। মনে এই বিশ্বাস রাখা যে, আমার নেকী হয়তো ত্রুটিপূর্ণ, কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁর অনুগ্রহে আমার এই আমলটি কবুল করবেন। বান্দা আল্লাহ সম্পর্কে যেমন ধারণা রাখে, আল্লাহ তার সাথে তেমনই আচরণ করেন। যেমন দোয়ার ব্যাপারে বলা হয়েছে, দোয়া করার পর কেউ যদি মনে করে তার দোয়া কবুল হবে না, তবে তার দোয়া কবুল হয় না। আর যদি সে বিশ্বাস রাখে যে, এটি কবুল হবে, তবে আল্লাহ তার দোয়া কবুল করে নেন। একইভাবে কোন নেকী করার পর মানুষের মনে এই ভালো ধারণা রাখা উচিত যে, আল্লাহ পাক ভালো কাজের প্রতিদান দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। আমার নেকী অপূর্ণাঙ্গ, কিন্তু আমি আল্লাহর কাছে আশা রাখি যে, তিনি এটি কবুল করবেন।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, ভালো ধারণার পাশাপাশি মনের মধ্যে ভয় ও আশা উভয়টিই রাখা। আশা থাকবে যে, ভালো কাজটি কবুল হয়ে যাবে। আর ভয় থাকবে যে, আমি যেভাবে নেকীটি করেছি, তা হয়তো কবুল হওয়ার যোগ্য নয়। এটি করা খুবই জরুরি, কারণ বলা হয়েছে: মুমিন আশা এবং

ভয়ের মাঝামাঝিতে হয়ে থাকে, অর্থাৎ না এমন ভয় যে, কবুল হওয়ার আশাই শেষ হয়ে যায় আর না এমন আশা যে, কোন ভয়ই থাকে না, এটা আল্লাহ পাকের সামনে নির্ভীক হওয়ার আলামত। এমনিভাবে আল্লাহ পাক কুরআন মাজিদে নেককার বান্দাদের যে গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, সেগুলা থেকেও এই বিষয়টি প্রকাশিত হয় যে, নেকী করে বান্দা আশাও রাখবে এবং ভয়ও রাখবে। যেমন: কুরআনে পাকে রহমান তথা আল্লাহ পাকের বান্দার যেই গুনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলার মধ্যে এই গুণাবরীও রয়েছে:

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ﴿۶۴﴾

(পারা: ১৯, সূরা: ফুরকান, আয়াত: ৬৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর ওইসব লোক, যারা রাত অতিবাহিত করে আপন প্রতিপালকের জন্য সিজদা ও কিয়ামের মধ্যে।

এর সাথে সাথে ইরশাদ করেছেন:

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۖ ﴿۶۵﴾

(পারা: ১৯, সূরা: ফুরকান, আয়াত: ৬৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর ওইসব লোক, যারা আরয করে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দিক থেকে ফিরিয়ে দিন জাহান্নামের শাস্তিকে, নিশ্চয় সেটার শাস্তি হচ্ছে গলার শৃংখল।

এখন দেখুন! সারারাত ইবাদত, কিয়াম, সিজদায় অতিবাহিত হলো, গুনাহের মধ্যে নয় কিন্তু এরপরেও আল্লাহ পাকের দরবারে মকবুল এই ব্যক্তিদের জাহান্নামের ভয় হয় যে, হে আল্লাহ! জাহান্নামের আযাব আমাদের থেকে ফিরিয়ে নাও। একইভাবে কুরআনে পাকে রয়েছে যে,

وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ

(পারা: ৩, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১৭)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর রাতের শেষ ভাগে ক্ষমাপ্রার্থীগণ।

অথবা ইরশাদ করেছেন:

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ
(পারা: ২১, সূরা: সাজদা, আয়াত: ১৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তাদের পার্শ্বদেশগুলো পৃথক থাকে শয্যাসমূহ থেকে।

বিছানাসমূহ থেকে পৃথক থেকে তারা কী করেন? এই ইবাদত, যিকির, তিলাওয়াত, কিন্তু এর পাশাপাশি কী ইরশাদ করেছেন,

يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا
(পারা: ২১, সূরা: সাজদা, আয়াত: ১৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর আপন প্রতিপালককে ডাকতে থাকে ভীত ও আশাবাদী হয়ে।

আল্লাহ পাকের আযাবের ভয় এবং এর সাওয়াবের আশাও রাখে। سُبْحٰنَ اللّٰه ! দেখুন ! রাতে বিছানা থেকে পৃথক, আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির, জায়নামাযে বসা, কুরআন খোলা, নফল পড়েই চলেছেন, এতদসত্ত্বেও আল্লাহ পাককে ডাকছেন তো ভয়ও রয়েছে এবং আশাও রয়েছে, আশাও আছে ভয়ও আছে, সুতরাং বিষয়টি ভয় এবং আশার মধ্যখানে থাকা উচিত। এখন এই বিষয়টি আমরা কিভাবে বুঝতে পারবো যে, আমাদের নেকীসমূহ আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হচ্ছে? এর মধ্যে প্রথম কথা হলো এটাই যে, এটা অদৃশ্যের বিষয়, আমরা (Confirm) নিশ্চিত করতে পারবো না যে, আল্লাহ পাক বলে দেওয়া ছাড়া আমাদের নেকী কবুল হয়েই গেছে। যেমনিভাবে সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর নেকী তাঁর বাবা আবু কুহাফা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ তাঁকে বলেছিলেন: আমি তোমাকে দেখি যে, দুর্বল গোলামদের আযাদ করে দাও। হায় ! তুমি যদি সুস্থ সবল গোলামদের আযাদ করে দিতে, যারা তোমার হেফাযত করতো এবং যুদ্ধে তোমার ঢাল হতো। হযরত আবু

বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: হে আমার বাবা! আমি তো কেবল আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি চাই। তখন এই আয়াতটি নাযিল হয়। (ইজালাতুল খফায়ি, ১/৩০১)বললেন, তারা হলেন ওইসব লোক, যাদের নেকীর কোন উদ্দেশ্য নেই শুধুমাত্র এটা ছাড়া যে,

اِلَّا ابۡتِغَآءَ وَجۡهِ رَبِّهِ الۡاَعۡلٰى ﴿۲۰﴾

(পারা: ৩০, সূরা: লাইল, আয়াত: ২০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: শুধুমাত্র স্বীয় প্রতিপালকের সন্তুষ্টি কামনা করে, যিনি সবেচেয় মহান।

তাঁর ব্যাপারে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে যে, সিদ্দিকে আকবরের নেকী কবুল হয়ে গেছে। অতঃপর ইরশাদ করেন,

وَلَسَوۡفَ يَرۡضٰى ﴿۲۱﴾

(পারা: ৩০, সূরা লাইল, আয়াত: ২১)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর অচিরেই সে সন্তুষ্ট হবে।

অথবা কবুল হওয়ার অকাট্য একটি দিক হলো এটাই যে, রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কবুলিয়্যতের সুসংবাদ শুনিয়ে দিলেন, যেমন হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে বললেন, হে বিলাল! আমাকে বলো তুমি ইসলামে কোন আমলটি এমন করেছো যেটার অধিক সাওয়াবের আশা রাখো? কারণ আমি জান্নাতে আমার আগে তোমার পায়ের আওয়াজ শুনেছি? তিনি বললেন, আমি খুব একটা আশানুরুপ কাজ করিনি, তবে হ্যাঁ, আমি দিন বা রাতের যেকোন সময়ে যখনই অযু বা গোসল করতাম, তখনই এই পরিমাণ নামায পড়ে নিতাম যা আল্লাহ পাক আমার তাকদীরে রেখেছেন। (মুসলিম, পৃ: ৯৫৭, হাদিস: ২৪৫৮) সুতরাং এখন তাঁর এই আমলটি কবুল হওয়ার সুসংবাদ রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বলে দিলেন। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বলেছেন, আমি যখন জান্নাতে প্রবেশ করলাম, সেখানে স্বর্ণ ও মণিমুক্তা দিয়ে

তৈরি একটি প্রাসাদ দেখলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম: এই প্রাসাদটি কার? বলা হলো: এটি ওমর ফারুকের প্রাসাদ। (বুখারী, ৩/৪৭০, হাদিস: ৫২২৬)এই ধরনের অনেক হাদিস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেখানে কবুল হওয়ার যে নিশ্চয়তা দিয়েছেন, তা কবুল হওয়াটা অকাট্য, কারণ কবুল হওয়াটা অদৃশ্যের (গায়েব) বিষয় এবং আল্লাহর নবী গায়েব জানেন। আল্লাহ পাক তাঁকে গায়েবের জ্ঞান দান করেছেন, তাই তিনি গায়েবের কোন খবর দিলে আমরা তার উপর "وَصَدَّقْنَا" এটিই আমাদের ঈমান, আমরা একে সত্য বলে বিশ্বাস করি। তবে আমাদের অবস্থা ভয় ও আশার মাঝে থাকা উচিত।

আমল কবুল হওয়ার একটি লক্ষণ: বুযুর্গরা নেক আমল কবুল হওয়ার একটি লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। তা হলো, কোনো নেক আমল কবুল হওয়ার পর আল্লাহ পাক বান্দাকে আরও একটি নেক আমল করার তাওফিক দান করেন। সুতরাং কেউ যদি একটি নেক কাজ করার পর আরেকটি নেক কাজ করার সুযোগ পায়, তবে তা প্রথম নেক কাজটি কবুল হওয়ার লক্ষণ। (লাত্বায়িফুল মাআরিফ, পৃ: ২২১) ঠিক যেমন তাওবা কবুল হওয়ার লক্ষণ সম্পর্কে বুযুর্গরা বলেছেন, বান্দা নিজেকে নিজে গুনাহ থেকে পবিত্র রাখে।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, পৃ: ৫৭)

আল্লাহ পাক যখন বান্দাকে সেই গুনাহটি দ্বিতীয়বার করতে দেন না, তখন প্রতীয়মান হয় যে, তার তাওবা কবুল হয়েছে। একইভাবে, নেক আমল কবুল হওয়ার একটি বড় লক্ষণ হলো, এর মাধ্যমে পরবর্তী নেক কাজ করার তাওফিক নসীব হয়।

সূচিপত্র

নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়ত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❁ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন "মাদানী কাফেলায়" সফর এবং ❁ প্রতিদিন "পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা" করার মাধ্যমে "নেক আমল" পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" ﷺ নিজের সংশোধনের জন্য "নেক আমল" পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "মাদানী কাফেলায়" সফর করতে হবে। ﷺ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

মেহ অফিস: ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৩৪৯১২৭২৬

জয়নাবে মদীনা ভবনে জামিয়া, জলপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০৩৭৮৫৮

আল-মদীনা শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৪৮৩৫১৬

জগদীশপাড়ী, মজার মোড়, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৬৪৮৬১৫২৬

E-mail: bangladesh@maktabatulmadinah.com, Web: www.dawateislami.net